GROW GREEN
গ্রীন ক্লাব নির্দেশিকা

গ্রীন ক্লাব নির্দেশিকা

প্রকাশকাল
জুন ২০১১

সার্বিক নির্দেশনায়
ফরিদ আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মোঃ ফেরদৌস আলম বিপ্লব

প্রমোশন অব্ এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস অ্যামাং স্কুল চিল্ড্রেন থ্রু গ্রীন ক্লাব প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ভবন, ই-১৬ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ৮৮ ০২ ৯১১৪৮২৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮ ০২ ৯১১৮৬৮২
ই-মেইল ঃ farid@doe-bd.org, ওয়েবঃ http://www.doe-bd.org

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর ৬ শতাংশ করে বেড়ে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, বেড়েছে শিক্ষার হার। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশগত সমস্যাও বাড়ছে আনুপাতিক হারে। দেশে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে বহুগুণে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট হলেও অধিদপ্তরের একার পক্ষে সমগ্র দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। এজন্য সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুদের যদি ছোটবেলা থেকে দেশের পরিবেশ ইস্যুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় এবং হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে পরিবেশ সংবেদনশীল করে তোলা যায় তাহলে তারা ভবিষ্যতে দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে। দেশে পরিবেশ সংবেদনশীল প্রজন্ম সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তায় **প্রমোশন অব এনভায়রনমেন্টাল এ্যাওয়ারনেস এ্যামাং স্কুল চিল্ড্রেন থ্রু গ্রীন ক্লাব প্রকল্পের** আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ছয়টি স্কুলে গ্রীন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের সমস্ত স্কুলে গ্রীন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে একটি পরিবেশ সংবেদনশীল জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেরাই নিজেদের পরিবেশকে যত্নে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

গ্রীনক্লাব নির্দেশিকাটিতে পানি, বায়ু, মাটি, বর্জ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদের সাথে অনুশীলনী যুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রীনক্লাব সদস্যরা হাতে-কলমে কাজ করে পরিবেশ ইস্যুর সাথে পরিচিত হতে পারবে। স্কুল পর্যায়ে গ্রীনক্লাব কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশিকাটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

(মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি)
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ শিক্ষা কি?

বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে পরিবেশ আর
মরা হাঁসের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না

পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি -
এ বিষয়ে হর-হামেশাই আলোচনা হয়

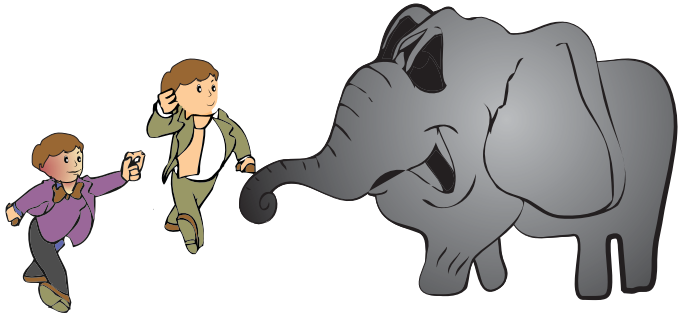

কিন্তু প্রায়ই এর ভুল ব্যাখ্যা করা হয়

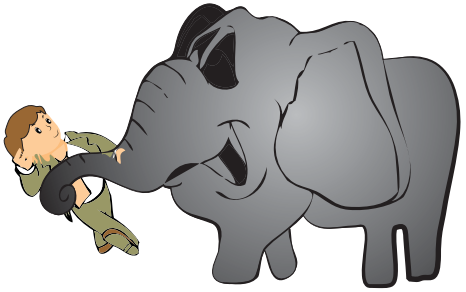

মুলত পরিবেশ শিক্ষা একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় -
বরং প্রত্যেক বিষয়ই পরিবেশ
বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে

পানি

- প্রতিদিন স্কুলে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ নির্ণয়
- স্কুলে পানি সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্কুলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ
- পানির পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- নিরাপদ পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ

বায়ু

- স্কুলে বাতাসের মান নির্ণয়
- স্কুলে সবুজ এলাকার পরিমাপ নির্ণয়
- বায়ুর গুণাগুনের উপর বিস্তারিত আলোচনা
- শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস নিশ্চিতকরণ

মাটি

- স্কুলের মাটি/ভূমি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠন
- স্কুলে সবুজ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ শতাংশে নির্ণয়
- স্কুলের গাছপালা ও পশুপাখির তালিকা প্রণয়ন
- স্কুলে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিবরণ প্রণয়ন

শক্তি

- স্কুলে ব্যবহৃত শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ
- শক্তির ব্যবহারের ফলে দূষণ সম্পর্কিত আলোচনা
- শক্তি অপচয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্কুলে শক্তির ব্যবহার হ্রাস মনিটরিং

বর্জ্য

- স্কুলের পরিবেশ সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্কুলে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ নির্ণয়
- স্কুলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

জলবায়ু

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির ক্ষেত্রসমুহ
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন
- গ্রীন হাউজ নিঃসরণ কমাতে গ্রহণীয় উদ্যোগ

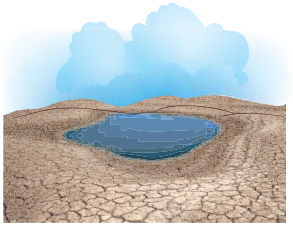

গ্রীন ক্লাবের গঠন

একজন সুপারভাইজারের (বিজ্ঞান/সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষক) তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশ জন নির্বাহী সদস্য (স্কুল ছাত্র) নিয়ে গ্রীন ক্লাব গঠিত হবে। সুপারভাইজারের পরামর্শ ও গ্রীন ক্লাব নির্দেশিকা অনুসরণে গ্রীন ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ক্লাবের সদস্যরা গ্রীন ক্লাব থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের অভিভাবকদের প্রদান করবে এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। গ্রীন ক্লাবের কার্যক্রম তদারকির জন্য স্কুল পরিবেশ পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে।

গ্রীন ক্লাব গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রমঃ

১। গ্রীন ক্লাব সুপারভাইজার নিয়োগ
২। দলের সদস্য নির্বাচন এবং কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে বাতাস,পানি, মাটি, বর্জ্য ও শক্তি শীর্ষক পাঁচটি দল গঠন
৩। দলের কার্যকরী সদস্যদের মধ্যে দলপতি নির্বাচন
৪। গ্রীন ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কক্ষ নির্ধারণ
৫। ক্লাব কক্ষ সজ্জাকরণ
৬। দলসমূহের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭। কার্যক্রমের সময়সীমা নির্ধারণ
৮। বিবিধ।

গ্রীন ক্লাবের সদস্যরা সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর কার্যক্রম পরিচালনা করবেঃ

১। পানি

২। বায়ু

৩। বর্জ্য

৪। শক্তি

৫। মাটি

৬। সমসাময়িক পরিবেশ ইস্যুর উপর সচেতনতামূলক কর্মসূচি (যেমনঃ শব্দ দূষণ, পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ, জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি)

৭। প্রণোদনামূলক কার্যক্রম

৮। সমাবেশ ও শোভাযাত্রা

৯। বিতর্ক, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা

১০। গ্রীন ক্লাবের প্রতিটি গ্রুপ প্রতিমাসে একবার তাদের কার্যক্রম এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর উপস্থাপনা করবে এবং এসব উপস্থাপনায় গ্রীন ক্লাবের সকল সদস্যসহ অভিভাবক, স্থানীয় কমিউনিটির মহিলা ও জ্যেষ্ঠ পুরুষ বিশেষ করে অবসর প্রাপ্তদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এভাবে গ্রীন কনসেপ্ট গৃহস্থালী ও কমিউনিটি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া যাবে।

পানি

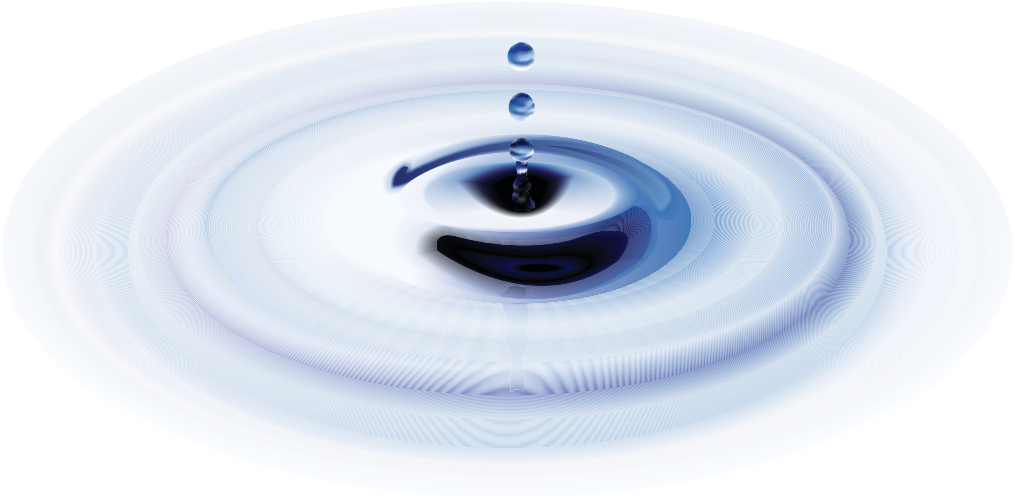

পানির রাসায়নিক সংকেতঃ H_20

পানির রাসায়নিক গঠন ঃ এক মৌল অক্সিজেন ও দুই মৌল হাইড্রোজেন ।

আমাদের এ গ্রহটি (পৃথিবী) কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সৃষ্টিকর্তা যেমন আমাদেরকে (মানুষ) সৃষ্টি করেছেন তেমনি পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন – সাদামাটা ভাবে এটা বোঝালেই চলে।গ্রহটি সূর্যের চারদিকে ঘোরে কেন ? না, না, সূর্যটাই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে – অনেকদিন আগে তো তাই বলা হতো। পরে বোঝা গেছে – পৃথিবীটাই ঘুরছে। কিন্তু কেন ঘোরে ? একটি ব্যাখ্যা এমনঃ সূর্য নামক গ্রহটি কোন একদিকে যাচ্ছিল এবং তখন বিপরীত দিকে একটি বড় গ্রহ যাচ্ছিল (তারা আপন মনে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল)। বড় গ্রহটি বুঝতে না পেরে ছোট গ্রহটির (সূর্য) খুব কাছে চলে এসেছিল। সেই আকর্ষণে সূর্যের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ আগ্নেয়গিরির লাভার মত নরম ছিল। বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশটি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে গিয়ে পুনরায় কয়েকটি ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের পৃথিবী সেই বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাগের এক ভাগ। এই গ্রহটি সূর্য হতে সৌভাগ্যক্রমে এমন দূরত্বে এসে পড়ে যেখানে বায়ু আছে; যেখানে সূর্যের তাপ এমন যে সবকিছু বরফ হয়ে যায় না। এই গ্রহটির মধ্যে পানি নামক যৌগ সৃষ্টি হয়েছে; এবং পানি জীবনের মূল উৎসের যোগান দিয়েছে। এখন এ গ্রহে অনেক অনেক প্রাণী আছে এবং প্রাণীর (মানুষের) প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই রয়েছে।

এই গ্রহটির উপরিভাগ শীতল হওয়া এবং এতে প্রাণের সঞ্চার হতে কত কোটি বছর সময় লেগেছে তা আমরা কেউ জানিনা। কিন্তু প্রাণের সঞ্চার হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া ছিল অপরিহার্য। আমরা মেনে নিতে পারি এ গ্রহে যেহেতু প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সেহেতু অনস্বীকার্য যে, প্রাণের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল। অনুকূল পরিবেশের একটি হলো পানির উপস্থিতি যা উপরে বলা হয়েছে।

পানি কোথায় কিভাবে আছে তা লেখা-পড়া জানা লোকমাত্রই জানেন। লেখাপড়া জানেন না এমন সাধারণ লোকও জানেন পুকুরে পানি আছে, নদীতে পানি আছে, মাটির নিচে পানি আছে। পানি আসে বৃষ্টি হতে, পানি আসে নদী দিয়ে উজান তথা পাহাড় হতে। নদী যদি গভীর হয় তবে নদীতে বেশী পানি থাকে। কিন্তু নদী যদি ভরাট হয়ে যেতে থাকে তবে নদীতে পানি কমে যায় এবং নদীতে পলি ভরাট হওয়ার গড় পরিমাণ (রেইট) যদি বেশী হয় তবে নদীতে পানির পরিমাণ কমতে কমতে এক সময়ে নদী শুকিয়ে মরে যেতে পারে। নদী মরে গেলে কী হয়? নদী তখন জমি হয়ে যায়; সে জমি হতে পারে কৃষি জমি অথবা মাছের ঘের, অথবা শিল্প কারখানা, এমনকি আমাদের বাড়িঘর।

জীবন ধারণের জন্য পানির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। জীবের মূল উৎসই পানি। পানি ছাড়া জীবন-যাপন অসম্ভব। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পানিকে ঘিরেই মানুষের সভ্যতা এবং বসতি গড়ে উঠেছে। এই মনুষ্য সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে পানির ব্যবহার যুক্তিসম্মত ও পরিমিত করার কোনো বিকল্প নেই। অপরিহার্য এই প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। পৃথিবীর মোট আয়তনের চারভাগের তিনভাগ জুড়েই রয়েছে পানি এবং বাকী এক ভাগে রয়েছে মাটি, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি।

পানির উৎসঃ

পানি সাধারণত নিম্নোক্ত উৎস থেকে পাওয়া যায়।

(১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি (Surface Water)

(২) ভূ-গর্ভস্থ পানি (Ground Water)

পৃথিবীতে পানির মজুদ প্রায় ১৪০ কোটি ঘন লিটার। বিভিন্নরূপে এই পানি সমুদ্র, নদী-নালা, খাল ও পুকুরে গচ্ছিত রয়েছে। এই পানির ৯৭.৫ শতাংশই লবণাক্ত যা পানের অযোগ্য। বাকী

২.৫ শতাংশ মিঠা পানি যার বেশীর ভাগ অংশই বরফ অবস্থায় জমাট বেধে রয়েছে। সামান্য পরিমাণ মিঠা পানি নদ-নদী, খাল-বিল,হ্রদ ও ভূ-গর্ভস্থে রয়েছে।

পানির বৈশিষ্ট্যঃ

পানির কোনো বর্ণ বা গন্ধ নেই। সাধারণত পানিকে তিনটি অবস্থায় পাওয়া যায়। (১) কঠিন (২) তরল ও (৩) বায়বীয়। পানির কোনো আকার নেই। যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে।

পানির ব্যবহারঃ নিত্য দিন নানা কাজে আমাদের পানি প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনে পানি একটি অপরিহার্য সঙ্গী। পানির উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো ঃ

১. গৃহস্থালী কাজেঃ পানি পান, রান্না, গোসল, প্রাকৃতিক কর্ম, কাপড় ধোয়া,
২. বাগান ইত্যাদি প্রয়োজনে পানি দরকার হয়।
৩. বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানঃ অফিস-আদালত, খাবার হোটেল, শিক্ষা-
৪. প্রতিষ্ঠান, এনজিও সর্বক্ষেত্রেই পানি অপরিহার্য।
৫. কল-কারখানাঃ পানি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। কল-কারখানায় উৎপাদন এবং
৬. যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখার জন্য পানি প্রয়োজন হয়।
৭. কৃষিঃ আমাদের দেশে কৃষি কাজে যথেষ্ট পানি প্রয়োজন হয়।
৮. শক্তি উৎপাদনঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনেও প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়।
৯. যে কোনো ধরণের গাড়ি চালানোর জন্য পানি প্রয়োজন হয়।

পানি দূষণঃ পানি দূষণের উৎসসমূহ নিম্নরূপঃ

১. শিল্পের অপরিশোধিত তরল বর্জ্য
২. গৃহস্থালী তরল বর্জ্য

৩. গবাদিপশু ও জীবজন্তুর মলমূত্র ও মৃতদেহ
৪. কৃষিজমি হতে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান
৫. বিভিন্ন ধরনের নৌযান হতে মলমূত্র, তৈলাক্ত দ্রব্যাদি ও আবর্জনা পানিতে ফেললে
৬. এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কঠিন বর্জ্য (গৃহস্থালি, শিল্প, পৌর, হাসপাতাল ইত্যাদি)
৭. সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করায় তা পানির সংস্পর্শে এসে পানিকে দূষিত করে।

পানি দূষণ বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম পরিবেশ সমস্যা। পানি দূষণের ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং খাদ্য সংকট সৃষ্টি হতে পারে। গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানি দূষণ মাত্রার ওপর ভিত্তি করে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) হোয়াইট ওয়াটার ঃ পানযোগ্য পানি
খ) গ্রে ওয়াটার ঃ স্বল্প মাত্রার দূষিত পানি। এ পানি সহজেই পুনঃব্যবহার করা যায়।
গ) ব্ল্যাক ওয়াটার ঃ ব্যবহার অনুপযোগী দূষিত পানি।

পানিদূষণের কারণে সৃষ্ট রোগঃ নিম্নে পানি বাহিত রোগের নাম দেওয়া হলোঃ

১. হেপাটাইটিস
২. পলিও
৩. জলবসন্ত
৪. ডায়রিয়া
৫. কলেরা
৬. আমাশয়
৭. টাইফয়েড
৮. বিভিন্ন চর্মরোগ ইত্যাদি।

*** পানি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর দশ নম্বরের একটি কুইজ পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।**

পানি ব্যবহারের টিপস্ ঃ

ক) অপরিচ্ছন্ন টয়লেট ব্যবহারের ভয়ে অনেক সময় মেয়েরা স্কুলে কম পানি পান করে, এতে তাদের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় ।

খ) খাওয়ার আগে ও পরে ঠিকমত সাবান দিয়ে হাত ধুলে এবং টয়লেটে স্যান্ডেল ব্যবহার করলে সহজেই নিরোগ থাকা যায় ।

গ) বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করা যায় ।

অনুশীলনী - ০১

স্কুলে পানির ব্যবহার ঃ

ব্যবহারের বিবরণ	পরিমাণ (লিটার)
পানীয় হিসেবে ব্যবহার	
ধৌত কাজ	
টয়লেট/বাথরুম	
রান্না	
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	
বাগান	
অন্যান্য	
মোট পানির ব্যবহার =	

অনুশীলনী -০২

○ স্কুলে পানি সরবরাহের উৎস কি? কিভাবে এবং কয়টি উপায়ে পানি পাওয়া যায়?

✓ সুপারভাইজারের সহায়তায় সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে স্কুলের পানির সরবরাহের উৎস

সর্ম্পকে জানতে হবে ।

- ○ প্রতিদিন স্কুলে কত লিটার পানির প্রয়োজন হয়?
- ✓ পানি সংরক্ষণ বা পানির অপচয় রোধের জন্য স্কুলে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্র ও পরিমাণ
- ○ সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে । এজন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ঃ
- ○ মিটার দেখে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ বের করতে হবে ।
- ○ স্কুলে পানির মিটার না থাকলে সে ক্ষেত্রে পানির ট্যাংকের মাপ এবং দৈনিক কত বার
- ○ মটর দিয়ে পানি উঠানো হয় তা হিসাব করে ব্যবহৃত পানির পরিমাপ করা যায় ।
- ○ মাথাপিছু পানি ব্যবহার বের করতে কয়েকদিনের গড় ব্যবহার জানা প্রয়োজন ।

$$\text{পানির মাথাপিছু গড় ব্যবহার} = \frac{\text{পানির ব্যবহার}}{\text{পানি ব্যবহারকারী}}$$

পানি ব্যবহারকারী = ছাত্র+শিক্ষক+প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান+অন্যান্য সদস্য ।

অনুশীলনী -০৩

- ○ পানির অপচয় রোধের জন্য ক্লাব সদস্যদের করণীয় ঃ
- ✓ অন্যদের বুঝিয়ে উদ্বুদ্ধ করা
- ✓ তাদের মাঝে সচেতনাতামূলক স্টিকার/লিফলেট বিতরণ
- ✓ নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দেওয়া

অনুশীলনী -০৪

স্কুলে পানি সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধে করণীয়

১. পানির পাইপে কোনোরূপ ছিদ্র রয়েছে কিনা পরীক্ষা করা

২. ট্যাপ থেকে পড়ে যাওয়া পানি বালতিতে সংরক্ষণ এবং তা ব্যবহার করা

৩. ট্যাপে পানি না থাকলে তা বন্ধ রাখতে হবে। কারণ যখন পানি আসবে তখন কেউ না থাকলে পানির অপচয় হবে

৪. ট্যাপ থেকে অপ্রয়োজনে যেন পানি না পড়ে

অনুশীলনী -০৫

○ পানি পুনরায় ব্যবহার উপযোগীকরণ

পানিকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। হাত ধোয়া বা অল্প নোংরা পানি সংরক্ষণ করে বাগানে ব্যবহার করা।

অনুশীলনী-০৬

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দৈনন্দিন কাজ এবং শিল্প-কারখানায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত পানিই ভূ-গর্ভস্থ। ফলে দেশের বড় শহরগুলোর ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ভূ-গর্ভে পানি সঞ্চালন করা প্রয়োজন। ভূ-গর্ভে পানি সঞ্চালনের জন্য গ্রীন ক্লাবের সদস্যরা স্কুলে একটি রি-চার্জ কূপ খনন করতে পারে।

বাতাস

বাতাস পরিবেশের একটি অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। বাতাস ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। বিশুদ্ধ বাতাস সেবন মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। একজন সুস্থ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ দিনে ১৬.৫ কেজি বাতাস গ্রহণ করে। আর প্রতিটি মানুষের জন্যই দূষণমুক্ত বাতাস সমভাবে অপরিহার্য।

বায়ুর বৈশিষ্ট্যঃ

বাতাস বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান নিয়ে গঠিত হয়। উপাদানগুলো হলোঃ

১. নাইট্রোজেন (৭৮.০৪%)
২. অক্সিজেন (২০.৯৬%)
৩. আর্গন (০.৯৩%)
৪. কার্বন ডাই অক্সাইড (০.০৩৯%)
৫. নিয়ন (০.০০১৮১%)

বায়ুর প্রধান ক্ষতিকারক গ্যাসসমূহ ঃ

১. কার্বন ডাই অক্সাইড
২. কার্বন মনো-অক্সাইড
৩. হাইড্রোজেন সালফাইড
৪. নাইট্রোজেন অক্সাইড
৫. সালফার ডাইঅক্সাইড
৬. হাইড্রো কার্বনসমূহ

বায়ু দূষণঃ

পরিবেষ্টক বায়ু মণ্ডলের গ্যাসসমূহ, বাষ্প, পানি ও বিন্দু কণাসমূহ, অনু পরমাণুসমূহ ইত্যাদির ঘনত্ব বা পরিমাণ যদি মানুষের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছায় তবে সে অবস্থাকেই বায়ু দূষণ বলা যায় ।

বায়ু দূষণের কারণসমূহঃ

১. কল-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া
২. যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া
৩. ইটেরভাটা, ধূলা-বালি
৪. কাঠ-কয়লার দহন থেকে উৎপাদিত ধোঁয়া
৫. আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত/লাভা নির্গমণ/বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের উদগীরণ

বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাঃ

১. মাথা ব্যাথা
২. চোখ জ্বালা করা
৩. গলা ব্যাথা
৪. শ্বাস কষ্ট
৫. হাঁপানী
৬. হৃদরোগ, রক্তস্বল্পতা, চর্মরোগ প্রভৃতি ।

বায়ু দূষণ রোধে ক্লাব সদস্যদের করণীয় ঃ

যানবাহনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরাঞ্চলে ক্রমাগত বায়ুদূষণ বাড়ছে । বায়ু দূষণরোধে নিম্নবর্ণিত অভ্যাস গঠন করতে হবেঃ

ক) স্কুলের রান্নাঘরে এমন চুলা ব্যবহার করতে হবে যাতে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না এবং স্কুলের মধ্যে ময়লা-আর্বজনা পোড়ানো থেকে বিরত থাকা ।

খ) বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো যানবাহন । যানবাহন সুষ্ঠভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীবহন করলে বায়ুদূষণ কম হতে পারে ।

গ) যানবাহণের ধরনের উপরও বাতাস দূষণ অনেকাংশে নির্ভর করে । যেমনঃ যাত্রী পরিবহনের প্রেক্ষিতে একটি বাসের তুলনায় একটি মোটর সাইকেল প্রায় আটগুণ বেশী দূষণ করে থাকে ।

ঘ) গণপরিবহন যেমন জ্বালানী সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষা করে তেমনি যানজট নিরসনেও ভূমিকা রাখতে পারে ।

ঙ) আধুনিক প্রযুক্তির যানবাহন সাধারণত কম দূষণ করে । এ সমস্ত যানবাহন ব্যবহার করে বাতাস দূষণ হ্রাস করা যায় ।

চ) স্কুলে যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন নিজে ব্যবহার করা ও অন্যকে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা ।

ছ) স্কুল প্রাঙ্গণ ধূলা-বালি মুক্ত রাখার জন্য কার্যক্রম ।

জ) যানবাহন ও কল-কারখানা থেকে ধোঁয়া রোধ করার জন্য জনমত গঠন ।

ঝ) বৃক্ষরোপণ ।

অনুশীলনী- ০১

বায়ু দূষণের প্রেক্ষাপটে স্কুলের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে । স্কুলের বাতাসের

- মান কেমন অথবা স্কুলটি বায়ু দূষণ প্রভাবিত এলাকার মধ্যে পড়ছে কি না?
- স্কুলটির অবস্থান শিল্প এলাকার মধ্যে কি না?
  ১০০ মিটারের মধ্যে ব্যস্ত ও যানজটযুক্ত রাস্তা আছে কি না?

অনুশীলনী- ০২

- স্কুলে সবুজ এলাকা পরিমাপ করে বের করতে হবে ।
- ✓ ক্লাব সদস্যরা স্কুলের সুপারভাইজারের সহায়তায় স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে স্কুলের মোট জায়গার পরিমাণ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেঃ

১. স্কুলের আয়তন নির্ণয়
২. সবুজ আচ্ছাদিত অংশের আয়তন যেমন-গাছ, ঘাস ও ঝোপ-ঝাড়ের আয়তন নির্ণয়
৩. মোট জায়গা যদি ১০০% হয়, সবুজ এলাকার পরিমাণ ৩৩% থাকতে হবে

$$\text{স্কুলে সবুজ এলাকার শতকরা পরিমাণ} = \frac{\textbf{মোট সবুজ জায়গা}}{\textbf{স্কুলের মোট আয়তন}} \times ১০০\%$$

অনুশীলনী- ০৩

- সুপারভাইজারগণ বায়ুর গুণাগুণের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবেন । যেমন বাতাসের মধ্যে কি কি উপাদান এবং উপাদানগুলো কি কি মাত্রায় থাকা প্রয়োজন তা আলোচনা করবেন এবং কুইজ প্রশ্ন করবেন ।

অনুশীলনী- ০৪

- ○ গ্রীন ক্লাবের সদস্যরা সুপারভাইজারের সহায়তায় শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস রয়েছে কিনা তা নির্ণয় করবে ।
- ✓ একটি স্কুলে মোট শ্রেণীকক্ষ এবং কয়টি শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস রয়েছে এবং কয়টিতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস রয়েছে তা নিরূপণ করা ।

শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকার সুবিধাসমূহঃ

১. বিশুদ্ধ বাতাস ও পর্যাপ্ত আলো শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে ।
২. শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
৩. আলো ও বাতাসের অপর্যাপ্ততার কারণে কক্ষ বদ্ধ, শ্বাসরুদ্ধকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে ।
৪. বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে কক্ষ দুর্গন্ধযুক্ত, স্যাঁতসেঁতে ও গরম হতে পারে ।

মাটি

স্থলজ উদ্ভিদ জন্মানোর প্রাকৃতিক মাধ্যমই মাটি। মাটি পরিবেশ ও প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে। মাটি দূষণের ফলে সমগ্র জীবজগতের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মানুষের জীবন ও জীবিকার পথ বন্ধ হয়।

মাটির গঠনঃ

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর সমন্বয়ে মাটি গঠিত হয়। যেমনঃ গাছপালা, প্রাণী ও অনুজীবসমূহ ও এদের মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ, বিভিন্ন শিলা হতে বিভিন্ন আকারের বালিকণা, পলিকণা ও এঁটেল, পানি ও বায়ু।

মাটির গঠন নিচে দেওয়া হলো ঃ

১। কঠিন পদার্থ ৫০%

ক) অজৈব/মিনারেল- ৪৫% (কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন/লৌহ, এলুমিনিয়াম, নাইট্রোজেন, সিলিকন ইত্যাদি ১৭টিরও বেশি উপাদান মাটিতে বিদ্যমান থাকে)।

খ) জৈব পদার্থ- ৫% (গাছপালা, প্রাণী ও অনুজীবসমূহ এবং মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ)।

২। তরল পদার্থ- ২৫%(পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ)।

৩। বাতাস- ২৫% (মাটির বাতাসে আর্দ্রতা ও কার্বনডাই অক্সাইড এর পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেন এর পরিমাণ কম থাকে)।

মাটির ৫০ ভাগ কঠিন বস্তু এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ ফাঁকা থাকে যার মধ্যে ২৫ ভাগ থাকে পানি এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ বায়ু।

মাটির কণাসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এ কণাসমূহের ব্যাস ২ মিলিমিটারের কম। ২ মিলিমিটারের বেশী ব্যাস এর কণাকে মাটির কণা হিসেবে গণ্য করা হয় না।

১। বালি (২মি.মি.-০.০৫ মি.মি.)।
২। পলি (০.০৫ মি.মি.-০.০০২ মি.মি.)।
৩। এঁটেল (০.০০২ মি.মি.)।

সাধারণত মাটিকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। মাটির কণাসমূহের উপাদানের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে।

১। বেলে মাটি।
২। পলি মাটি।
৩। এঁটেল মাটি।
৪। দোআঁশ মাটি।

মাটির ব্যবহারঃ

১। কৃষি
২। বসতি
৩। অবকাঠামো
৪। বনভূমি
৫। নগর/গ্রাম ইত্যাদি।

মাটির অবনয়ন (degradation)ঃ

১। **বর্জ্যঃ**

ক) শিল্প কারখানার বর্জ্য (কঠিন ও তরল বর্জ্য)
খ) গৃহস্থালী বর্জ্য যেমনঃ পলিথিন, ব্যাটারী, প্লাষ্টিক ইত্যাদি

গ) হাসপাতাল বর্জ্য: স্যালাইন ব্যাগ,সিরিঞ্জ, কটন, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি

২। **কৃষি কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ**

ক) উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি

খ) অতিরিক্ত সারের অযাচিত ব্যবহার,

গ) অপ্রচলিত প্রজাতির উদ্ভিদ এর রোপণ ইত্যাদি

৩। বনভূমি ধ্বংস।

৪। বৃক্ষ নিধন।

৫। অপরিকল্পিত নগরায়ণ/শিল্পায়ন/অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।

মাটি দূষণের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষতির কারণ ঘটছেঃ

১। মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস

২। ফসলের উৎপাদন হ্রাস

৩। ফসলে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি (যেমনঃ আর্সেনিক, বিভিন্ন ধরনের হেভীমেটাল ইত্যাদি)।

৪। ফসলি জমির পরিমাণ হ্রাস

৫। বিভিন্ন রোগের বিস্তার বৃদ্ধি পাবে

স্কুলের মাটি/ভূমি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠনের জন্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুশীলন করা যেতে পারে ঃ

অনুশীলনী-০১

স্কুলে শতকরা কতটুকু জায়গা সবুজে আচ্ছাদিত তা নির্ধারণ করা। এ কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত অনুশীলনী চর্চা করতে হবে।

ক্রমিক	ভূমি	পরিমাপ (স্কয়ার মিটার)
১	কংক্রিটে আচ্ছাদিত	
২	সবুজ আচ্ছাদিত	
৩	বৃক্ষ বা উদ্ভিদবিহীন উন্মুক্ত জায়গা	
মোট জায়গা		

স্কুলের মোট ভুমির কমপক্ষে তেত্রিশ শতাংশ সবুজে আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন।

এখন, শতাংশে সবুজ আচ্ছাদিত ভূমি $= \frac{\text{মোট সবুজ জায়গা}}{\text{মোট জায়গা}} \times ১০০$

স্কুলের মোট ভুমির কমপক্ষে এগার শতাংশ বৃক্ষে আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন।

বৃক্ষ আচ্ছাদিত জায়গার পরিমাণ $= \frac{\text{মোট গাছপালা বেষ্টিত জায়গা}}{\text{মোট ভূমি}} \times ১০০$

অনুশীলনী-০২

- ○ স্কুলে কি কি গাছপালা ও পশু-পাখি রয়েছে এবং কি ধরনের গাছপালা লাগানো ও পশু পাখি পালন করা সম্ভব তা নিরূপণ করা
- ✓ দুটি দলকে ভাগ করে, এক দল গাছ-পালা নিরূপণ করবে অন্য দল পশু-পাখি নিরূপণ করবেঃ

গাছ নিরূপণঃ

ক্রমিক	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ধরন			মন্তব্য
			গাছ	ঘাস	ঝোপ/ফুল/বাহারী গাছ	

পশু-পাখি নিরূপণঃ

ক্রমিক	নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	মেরুদণ্ডী/অমেরুদণ্ডী প্রাণী	মন্তব্য

অনুশীলনী-০৩

স্কুলে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিবরণ প্রণয়ন

ক্রমিক	রাসায়নিকের নাম	ব্যবহারের ক্ষেত্র	পরিমাণ
১		পতঙ্গ দমন	
২		টয়লেট/মেঝে পরিস্কার	
৩		বাগান/কৃষি	
৪		পরীক্ষাগার	

অনুশীলনী-০৪

- ○ স্কুলে মাটির ব্যবহার, দূষণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে একটি সাধারণ গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের গণসচেতনতার মাত্রা নিরুপণের জন্য জরিপ পরিচালনা করতে হবে।
- ✓ স্কুলে প্রশাসনকে মাটি দূষণ রোধে ভূমিকা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

বর্জ্য

দৈনন্দিন ব্যবহারের অপ্রয়োজনীয় অংশ বা উপাদানকেই বর্জ্য বলে। যা ব্যবহারের অযোগ্য তাই বর্জ্য।

অথবা

যে কোনো বস্তু যা কঠিন,তরল, বায়বীয় বা রেডিও একটিভ যা প্রকৃতিতে ফেলে দেয়া/উদগীরণ করা/নিক্ষেপ করা হয় এবং তা প্রকৃতির বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় তাই বর্জ্য।

অথবা

যে কোনো জিনিস যার সাধারণত পরবর্তী কোন ব্যবহার নেই তাই বর্জ্য।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হলে তা পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাড়ায়। অন্যদিকে বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হলে তা সম্পদে পরিণত হয়।

বর্জ্যের ধরনঃ

অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বর্জ্য তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) কঠিন বর্জ্য
খ) তরল বর্জ্য
গ) বায়বীয় বর্জ্য

কঠিন বর্জ্যকে আবার উৎসের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়ঃ যেমন,

ক) পৌর বর্জ্য ঃ শহর অঞ্চলের দৈনন্দিন কাজের উচ্ছিষ্টাংশই পৌর বর্জ্য। যেমনঃ রান্না ঘরের বর্জ্য, কাগজ, কাপড়, স্যুয়ারেজ ইত্যাদি।
খ) শিল্প বর্জ্যঃ শিল্প কারখানা হতে উৎপাদিত বর্জ্য ।
গ) কৃষি বর্জ্যঃ কৃষি কাজ/চাষবাস করার ফলে যে সকল বর্জ্য/আবর্জনার সৃষ্টি হয়।
ঘ) হাসপাতাল বর্জ্যঃ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বর্জ্য, যেমনঃ ব্যবহৃত

সূঁচ, ব্যান্ডেজ, রক্ত ইত্যাদি ।

ঙ) ইলেকট্রনিক বর্জ্যঃ ইলেকট্রনিক পণ্য যা ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়, যেমনঃ ব্যাটারি, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্য এবং যন্ত্রাংশ ।

চ) রেডিও একটিভ বর্জ্য/পারমানবিক বর্জ্য ঃ যে সমস্ত তেজস্ক্রিয় মৌল ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয়, যেমনঃ (১) নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরে উৎপাদিত বর্জ্য (২) নিউক্লিয়ার চিকিৎসায় উৎপাদিত তেজস্ক্রিয়তা (৩) নিউক্লিয়ার কৃষি গবেষণায় উৎপাদিত তেজস্ক্রিয়তা ।

তরল বর্জ্যকেও কঠিন বর্জ্যের মতো উৎসের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

পৌর তরল বর্জ্যঃ যেমন, স্যুয়ারেজ

শিল্প তরল বর্জ্যঃ যেমন, অপরিশোধিত তরল বর্জ্য

কৃষি তরল বর্জ্যঃ জমিতে সার/কীটনাশক/বালাইনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিলে/বৃষ্টি হলে/বন্যা হলে জমি হতে ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা দূষিত হয় ।

বিভিন্ন উৎস হতে গ্যাসীয় বর্জ্য উৎপন্ন হতে পারে ঃ যেমন,

শিল্প-কারখানা ঃ শিল্প কারখানা থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন গ্যাস ও ধোঁয়া ।

বিভিন্ন প্রকার খনি হতে আকরিক উত্তোলনের সময় বিভিন্ন গ্যাসীয় বর্জ্য উৎপন্ন হয় ।

আগ্নেয়গিরী ঃ সময়ে সময়ে আগ্নেয়গিরী থেকে গ্যাসীয় পদার্থের উদগীরণ ঘটে ।

রাস্তা নির্মাণ (বিটুমিন যুক্ত রাস্তা) ঃ রাস্তা নিমার্ণের সময় বিটুমিন তরল করলে গ্যাসীয় বাস্প ও ধোঁয়া উৎপন্ন হয় ।

গাছ-পালা/জৈব পদার্থ পোড়ানোর ফলে গ্যাসীয় পদার্থ ও ধোঁয়া উৎপন্ন হয় ।

সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে নিম্নবর্ণিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারেঃ

স্বাস্থ্যগতঃ বর্জ্য বিভিন্ন রোগের সংক্রমন ঘটাতে পারে। শিল্প বর্জ্যের কারণে পানি দূষিত হয়ে পড়লে চর্মরোগসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ হতে পারে। যেমনঃ জলবসন্ত, টাইফয়েড, জন্ডিস, ইত্যাদি।

আর্থিকঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ বর্জ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে।

কৃষি জমিঃ কৃষি ভূমি গুণগতমান হারায়।

প্রাকৃতিক জলাধারঃ কঠিন ও তরল বর্জ্য আমাদের প্রাকৃতিক জলাধারসমূহ ধ্বংস করছে।

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

বায়ুতে ক্ষতিকারক গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুশীলনী-০১

পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় ঃ

যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা।

উৎসে আবর্জনা পৃথক করা।

জৈব ও অজৈব আবর্জনা পৃথক রাখা।

বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃব্যবহার উপযোগী করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

অনুশীলনী-০২

স্কুল বর্জ্যের শ্রেণীবিভাগ কর

ক্রমিক	বর্জ্যের ধরন	বর্জ্যের উৎস	পরিমাণ (প্রতিমাসে)
১	প্লাস্টিক		
২	কাগজ		
৩	খাদ্য		
৪	মাটি, কাদা, ধুলা		
৫	কাঁচ, কাঠ, লোহা, টিন ইত্যাদি		
৬	মেডিক্যাল বর্জ্য		

অনুশীলনী-০৩

○ **স্কুলে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা ঃ**

$$\text{গড় বর্জ্য} = \frac{\text{স্কুলে বর্জ্যের মোট উৎপাদন}}{\text{স্কুলের মোট মানুষ}}$$

অনুশীলনী-০৪

স্কুলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করা যেতে পারে ঃ

১. অব্যবহার্য দ্রব্যাদি খুঁজে বের করা এবং তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা ।

২. পুনঃব্যবহার উপযোগী দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা ।

৩. পুরাতন বই সংগ্রহ করে তা নতুন বছরের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ ।

৪. সাধারণ সদস্যদেরকে বর্জ্য এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ধারণা দেওয়া এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করা ।

৫. যেসব দ্রব্য পুনঃব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব নয়, তার তালিকা করা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।

৬. পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করা ।

শক্তি

মহাবিশ্বে Energy বা শক্তি নানারূপে বিরাজমান। যেমন-আলোক শক্তি, তাপ শক্তি, শব্দ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদি। পাঠ্য বই এর ভাষায় কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। এই সামর্থ্য আসে কোথা থেকে? উত্তর হলো শক্তির নানা উৎস হতে। যেমন-পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস হলো সূর্য। সূর্য হতে আমরা আলোক শক্তি ও তাপ শক্তি পাই। পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই শক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজে শক্তির যোগান আসে জ্বালানী থেকে। জ্বালানী পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে ব্যবহার করে চলে তাপ ইঞ্জিন। আর ইঞ্জিন চললেই গাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি চলবে। আবার কয়লা বা গ্যাস পুড়িয়ে উৎপন্ন শক্তি জেনারেটরের সাহায্যে রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে। বিদ্যুতের ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই জানি। জ্বালানী পুড়িয়ে এই যে তাপ শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি এবং বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়, তা দিয়েই বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি নীরবে ঘটে গেছে কিছু ভয়ংকর ঘটনা। পৃথিবীতে দূষণ বেড়েছে, তাপমাত্রা বেড়েছে। গ্রীন হাউজ ইফেক্ট এখন একটি পরিচিত কথা। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধিই এর মূল কারণ। কলকারখানা এবং যানবাহন হতে এই কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি নির্গত হয়। তাপ বাড়ায় উত্তর দক্ষিণ মেরুর বরফ বেশি মাত্রায় গলছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে, যা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিপদ ডেকে আনছে।

উন্নতির নেশায় পৃথিবীর মানুষ তার অকৃত্রিম বন্ধু প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভুলে গেছে। নির্বিচারে জ্বালানীর ব্যবহারে একদিকে যেমন দূষণ বাড়াচ্ছে, পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে তেমনি ডেকে আনছে নানা প্রলয়ংকারী দুর্যোগ। তোমরা পাঁচ বন্ধু, সবার গাড়ি আছে। সবাই আলাদাভাবে স্কুলে আসলে পাঁচগুণ জ্বালানী পুড়লো। ধরা যাক, তোমরা যদি একত্রে একজনের গাড়িতে আস তাহলে অল্প জ্বালানী ব্যবহার হলো। পৃথিবীও কম উষ্ণ হলো। আরো ভালো হয় প্রতিটি স্কুলের যদি স্কুল বাস থাকে এবং

সবাই তাতে যাওয়া আসা করে। সৌর শক্তি, বায়ু বা স্রোতের শক্তি ব্যবহারে কোনো দূষণ হয় না। সূর্য শক্তির অন্যতম উৎস হলেও আমরা এখনও এর পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারছি না।

শক্তির উৎসঃ

শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তি।

নবায়নযোগ্য শক্তিঃ

১. সৌর শক্তি
২. বায়ু শক্তি
৩. পানি শক্তি
৪. পারমানবিক শক্তি
৫. বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উৎপাদিত শক্তি

অনবায়নযোগ্য শক্তিঃ

১. তেল-পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন
২. কয়লা
৩. প্রাকৃতিক গ্যাস

শক্তির ব্যবহার ঃ

শক্তির ব্যবহার অপরিসীম। শক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। শক্তির প্রধান সুবিধা হলো এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শক্তি ব্যবহার হয়। নিচে উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১. বসতবাড়িতে
২. কল-কারখানা

৩. অফিস-আদালত
৪. হাসপাতাল, ব্যাংক, বীমা, রেস্তোরা
৫. যান্ত্রিক বাহন ইত্যাদি ।

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র ঃ

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন
২. তাপ শক্তি উৎপাদন
৩. পারমানবিক শক্তি উৎপাদন
৪. শব্দ শক্তি উৎপাদন
৫. ফলিত শক্তি উৎপাদন
৬. যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন
৭. তেজস্ক্রিয় শক্তি উৎপাদন
৮. পানি শক্তিতে রূপান্তর

শক্তি ব্যবহারের ফলে দূষণঃ

১. নিউক্লিয়ার বা পারমানবিক শক্তি থেকে নিউক্লিয়াস নির্গত হয়ে পরিবেশ দূষণ করে ।
২. জীবাশ্ম তেল পুড়িয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করেও পরিবেশ দূষণ হয় ।
৩. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারেও পরিবেশ দূষিত হয় ।

শক্তির অপচয় রোধে গ্রীন ক্লাবের সদস্যদের করণীয়ঃ

১. অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বাতি/পাখা বন্ধ রাখা
২. সাধারণ বাতির পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার

(১) এয়ারকুলারের ফিল্টার পরিচ্ছন্ন রাখা

(২) গবেষণাগার, কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহারের পর যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা

(৩) অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাসের চুলায় কাপড় না শুকানো

(৫) রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা

(৬) শক্তির অপচয় রোধে সকলকে উৎসাহিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে ক্লাব সদস্যরা কার্যক্রম গ্রহণ করবে ।

অনুশীলনী-০১

গ্রীন ক্লাব সদস্যরা সুপারভাইজারের সাহায্যে স্কুলে ব্যবহৃত শক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেঃ

ক্রমিক	শক্তির উৎস	মাসিক ব্যবহার
১	বিদ্যুৎ	
২	পেট্রোল	
৩	ডিজেল	
৪	কেরোসিন	
৫	সোলার	
৬	সিএনজি	
৭	এলপিজি	
	মোট শক্তির ব্যবহার	

$$\text{একদিনে শক্তির ব্যবহার} = \frac{\text{মোট শক্তির ব্যবহার}}{৩০}$$

$$\text{মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার} = \frac{\text{একদিনে মোট শক্তির ব্যবহার}}{\text{স্কুলের মোট জনসংখ্যা}}$$

অনুশীলনী-০২

○ **স্কুলে শক্তির ব্যবহার হ্রাস মনিটরিং ঃ**

✓ বিগত বছরের সাথে বর্তমান বছরের শক্তি ব্যবহার তুলনা করে শক্তির ব্যবহার হ্রাস মনিটরিং করা যায় । স্কুলে শক্তি ব্যবহার হ্রাস মনিটরিং-এর জন্য নিম্নের চার্টটি ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

ক্রমিক	মনিটরিং পয়েন্ট/ শক্তির উৎস	গত বছরের ব্যবহার	বর্তমান বছরের ব্যবহার	ব্যবহারের ক্ষেত্র
১	বৈদ্যুতিক মিটার			
২	পেট্রোল			
৩	ডিজেল			
৪	কেরোসিন			
৫	সিএনজি			
৬	এলপিজি			
৭	সৌরশক্তি			

$$\text{বিগত বছরের ব্যবহার} = \frac{\text{বর্তমান বছরের শক্তির ব্যবহার}}{\text{বিগত বছরের স্কুলের জনসংখ্যা}}$$

$$\text{বর্তমান বছরের ব্যবহার} = \frac{\text{বর্তমান বছরের শক্তির ব্যবহার}}{\text{বর্তমান বছরের স্কুলের জনসংখ্যা}}$$

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

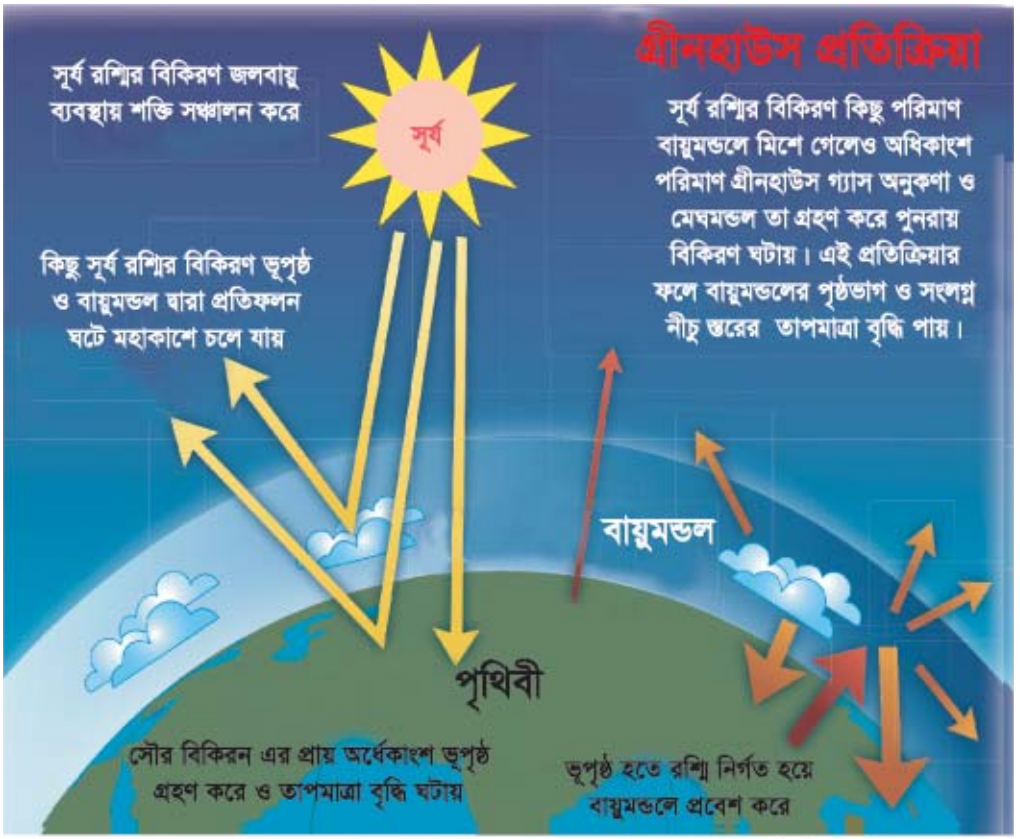

সূত্র: আইপিসিসি চতুর্থ সমীক্ষা প্রতিবেদন, ২০০৭

আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

আবহাওয়া ও জলবায়ু এক জিনিস নয় । আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনশীল অবস্থা অর্থাৎ তাপমাত্রা, বায়ু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মেঘাচ্ছন্নতা ও অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তনশীল অবস্থাকেই আবহাওয়া বলে । আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় । এটা হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের তাৎক্ষণিক অবস্থা এবং স্বল্পপরিসরে এর পূর্বাভাস প্রদান করা যায় ।

অন্যদিকে জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকা বা ভৌগলিক অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের গড় আবহাওয়া । ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন আবহাওয়ার সাধারণ বা গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে । জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ ইত্যাদি । একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ।

দুই-এক দিনের আবহাওয়ার তারতম্য হওয়া মানেই জলবায়ু পরিবর্তন নয় । জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপারটি বুঝতে হলে অবশ্যই ৩৫-৪০ বছরের আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে ।

জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

জলবায়ুর পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা ব্যপকভাবে প্রভাবিত হয় । পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায় । গরম কাল আরও তাপময়, অনিয়মিত ও অসময়ে বৃষ্টি, কম সময়ে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি এবং এর ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও ভূমি ধ্বস, শুষ্ক মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা ও খরার ফলে ফসলহানি, উপকূলীয় এলাকায় মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা হ্রাস ইত্যাদি অনেক কিছুই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফল ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা Global Warming। শিল্প বিপবের পর হতে বায়ুমণ্ডলে তাপ ধরে রাখতে সক্ষম গ্যাস (যেমন- সিএফসি, কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, মিথেন, কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড) এর পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েই চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংস্থা IPCC (Intergovernmental Pannel on Climate Change) এর প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়াকে জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মনে করছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

১৮ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের হার বেশ দ্রুত হয়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে জমাট বাধা বরফ গলতে শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস ও তুষারপাত আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ধারা চলতে থাকলে একসময় পৃথিবী মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

প্রাকৃতিক কারণসমূহঃ	**মনুষ্য সৃষ্ট কারণ সমূহঃ**
ক) মহাদেশীয় ড্রিফট খ) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত গ) পৃথিবীর গতি পরিবর্তন ঘ) সামুদ্রিক স্রোত ঙ) দাবানল	ক) বনভূমি উজাড়/ধ্বংস খ) খনি থেকে আকরিক উত্তোলনের সময় বিভিন্ন গ্রীন হাউজ গ্যাস ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুতে মিশে যাচ্ছে গ) বিভিন্ন শিল্প কারখানা থেকে নির্গত গ্রীন হাউজ গ্যাস ঘ) যানবাহন থেকে নির্গত গ্রীন হাউজ গ্যাস

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সব প্রভাব প্রধানত লক্ষণীয় সেগুলো হচ্ছে :

- **তাপমাত্রা বৃদ্ধি**
- **বন্যা ও আকস্মিক বন্যা**
- **অতিবৃষ্টি**
- **খরা**
- **লবণাক্ততা বৃদ্ধি**
- **ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস**

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ঃ

কৃষি খাত ঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কৃষি এখনও জলবায়ুর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সূর্যের আলো, আর্দ্রতা ইত্যাদির সাথে কৃষি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য ঘটছে এবং এর বিরূপ প্রভাব সরাসরি কৃষির উপর পড়ছে।

মৎস্য সম্পদ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্য সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে মাছের প্রজাতি এবং কমছে উৎপাদন। মৎস্য সম্পদের ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ত্বরান্বিত হবে মৎস্য খাতের ক্রমাবনতি।

পানি সম্পদ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি সম্পদে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটতে পারে তা হল- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি, হিমালয় অঞ্চলের জমাট বরফ গলে যাওয়া, বাষ্পীভবনের মাত্রা বৃদ্ধি, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এর ফলে- আকস্মিক বন্যা ও জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, নদ-নদীসমুহের নাব্যতা হ্রাস পাবে, শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীসমূহের

পানি প্রবাহ আরও হ্রাস পাবে, নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে, লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। এতে ভবিষ্যতে পানি সম্পদ চক্রে একটি বড় পরিবর্তন দেখা দেয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

জনস্বাস্থ্য ঃ সাম্প্রতিক গবেষণায় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও জোয়ারের পানি বৃদ্ধির সাথে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা আরো বাড়বে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের করণীয় ঃ

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবেলায় সকলের সর্বস্তরে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজনে করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে। উন্নয়ন খাতসমূহে অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশলের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলোঃ

খাত সমুহ	অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল
পানি	বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা, ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার, লবণাক্ততা দূরীকরণ, পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জন
কৃষি	চারা রোপনের সময় নির্ধারণ, শস্য বৈচিত্র্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন- বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
অবকাঠামো	পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বসতি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন, স্থায়ীত্বশীল বাঁধ নির্মাণ, প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জনস্বাস্থ্য	জরুরী স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু জনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
যোগাযোগ	পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন, রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করা
শক্তি	বণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, জ্বালানীর সু-ব্যবহার, একটি মাত্র শক্তি উৎসের নির্ভরতা কমিয়ে শক্তির উৎস বাড়তে হবে

অনুশীলনী-০১: সুপারভাইজারের সহায়তায় সদস্যগণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিভাবে প্রশমিত করা যায় তা জানবে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমণঃ

বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে বা গ্রীন হাউজগ্যাস নিঃসরণ কমাতে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি-

১. সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা অনুসরণ করা
২. খনিজ জ্বালানী ব্যবহার হ্রাস করা
৩. জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া
৪. নবায়নযোগ্য শক্তির (বায়ুকল, সৌর শক্তি ইত্যাদি) ব্যবহার বাড়ানো
৫. পাবলিক পরিবহন, সাইকেল ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ানো
৬. কাগজ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া
৭. বৃক্ষরোপণ করা
৮. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
৯. বায়োগ্যাস তৈরি ও ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী চাহিদা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

অনুশীলনী-০২ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর ছোট একটি কুইজ পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। পরীক্ষার নম্বর হবে ১০।

কুইজ পরীক্ষাটি ওপেন বুক (open book) বা স্মৃতিশক্তির উপর (un-seen) ভিত্তি করে হতে পারে।

স্কুল গ্রীণক্লাবের প্রধান কার্যক্রম

গ্রীনক্লাব কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো টেকসই সম্পদ ব্যবহারের অভ্যাস গঠন এবং একইসাথে স্কুলে সম্পদ ভোগ ও এর অপচয়ের ওপর দৃশ্যপট নির্মাণ। গ্রীনক্লাবের সদস্যরা নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর হাতে-কলমে কাজ এবং তথ্য সংগ্রহ করবেঃ

পানি ঃ পানি সংবেদনশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পানির গুরুত্ব, উৎস ও সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ করা ।

বায়ু ঃ মানুষের বিশুদ্ধ বায়ুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বায়ুমানের ওপর দেশের পরিবহন নীতির প্রভাব বোঝা এবং বায়ুমান উন্নয়নের জন্য কাজ করা ।

মাটি ঃ স্কুলের সবুজ এলাকার দৃশ্যাপট নির্মাণসহ ভূমি ব্যবহার, জীববৈচিত্র ইত্যাদি সর্ম্পকে জানা এবং এসব সম্পদের অসামান্য অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ।

শক্তি ঃ স্কুলের শক্তির উৎস ও ব্যবহার সর্ম্পকে জানা এবং শক্তি সাশ্রয় করে ব্যয় ও দূষণ হ্রাসের জন্য কাজ করা ।

বর্জ্য ঃ স্কুলে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমান নির্ণয় করা এবং বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনঃব্যবহার ও পুনঃব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করা ।